১০৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB. 27 1999 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রসঙ্গঃ আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার

কামাক্ষা নাথ সেন

মাতৃভাষা বাংলাকে নিয়ে যে দু'জন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন রবীন্দ্রনাথ অপরজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এ দু'জনই বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে বিশ্বের দুয়ারে গর্ব ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। উদ্বোধক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী ভাষণ বাংলা ভাষায় প্রদান করেন। এর আগে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কেহ বাংলায় ভাষণ প্রদান করেননি। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই শিক্ষার ভাষা ও শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা।" কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ১৯৩৫ সালে ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ের উত্তরই মাতৃভাষায় দিতে পারবে বলে সিদ্ধান্ত নেন। রবীন্দ্রনাথ এতে খুব আনন্দিত হন। মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দনাথ অনেক কথাই বলেছেন। তিনি 'বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "যাঁহারা অনেক ইংরাজী কেতাব পড়িয়াছেন তাঁহারা অনেকেই আধুনিক বাংলা লেখা ও লেখকদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়ে থাকেন। এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। একটা কথা ভুলিয়া যান যে, পৃথিবীতে বড়ো হওয়া শক্ত, কিন্তু আপনাকে বড়ো মনে করা সকলের চেয়ে সহজ।"

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "পোকা কিল্‌বিল্ করছে। এ বাক্যের ভাবটা-ছবিটা কোনো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। খিট্‌খিটে শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজীতে আছে, কিন্তু খিট্‌খিটে শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুরচুর হওয়া, কট্‌মট্ করে তাকানো, ধপাস্ করে পড়া, পা টন্‌টন্ করা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, ঠিক এসব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়।"

রবীন্দ্রনাথের মতোই রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ১৩০২ সালে 'ইংরেজী শিক্ষার পরিণাম' প্রবন্ধে লিখেছেন, "ষাট বছরের ইরেজী শিক্ষার ফলে আমরা ভাঙ্গিতে শিখিয়াছি, গড়িতে শিখি নাই, আমাদের আহারের দ্রব্য বাড়িয়াছে, কিন্তু পরিপাকের শক্তি বাড়ে নাই। আমরা পরের কথার আবৃত্তি করিতে পারি, কিন্তু স্বয়ং বাক্যরচনা করিতে, জানি না। জ্ঞানালোচনায় আমাদের স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা নাই, আমরা আত্মনির্ভর ও আত্মমর্যাদা জানি না।"

বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে যে ব্যক্তির নাম যুক্ত, যে মানুষটির কাছে ইতিহাসের দায়বদ্ধতা, যিনি ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়েছেন ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়িয়েছেন, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্বরতম হত্যাকান্ডের বিচারের রায় হলো তেইশ বছর পর ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নিকৃষ্টতম হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, অভিযোগের তদন্ত হয়েছে, চার্জশিট দাখিল হয়েছে, প্রত্যেক অপরাধীকে উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেয়া হয়েছে, সাক্ষ্যজেরা হয়েছে, যুক্তিতর্ক বিশ্লেষণ হয়েছে এবং সবশেষে আদালত তার রায় ঘোষণা করেছে। রায় ঘোষণার পরের দিন, ৯ নভেম্বর অধিকাংশ দৈনিকে বাংলা ভাষায় লিখিত রায়টি ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ রায় পাঠ করেছেন। জেলা শহর টাংগাইলেও সকাল দশটার মধ্যে পত্রিকা শেষ হয়েছে, হকারের হাত হয়েছে খালি। কোথাও কোথাও দেখা গেছে একজন উচ্চৈঃস্বরে পত্রিকায় ছাপা রায় পাঠ করছেন ও অন্যরা সম্মিলিতভাবে শুনছেন। এ যেন এক বিশাল উন্মাদনা। রায়ের মাধ্যমে পাঠক-শ্রোতার নিজের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। এসব সম্ভব হয়েছে আমাদের মুখের ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষায় রায় প্রদানের জন্য। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'প্রজাতন্ত্রের বিচার শক্তি ও জনগণের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য। "পরভাষায় আইন চর্চার ফলে আমরা আইনশাস্ত্রে স্বাভাবিক সহজতা লাভ করিনি, তেমন কোনো মৌলিক অবদানও আমরা রাখিনি। একজন নিরক্ষর নাগরিকের কাছে বাংলায় কেন, যে কোনো ভাষাতেই লেখা রায় দুর্বোধ্য হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলায় তা লেখা হলে কেউ পড়ে শুনালে, তার অনেকখানি মর্মোদ্ধার তার পক্ষে করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে বড়ো রকমের যুক্তি প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আইনী সমাজে আজ একটা বহু আলোচিত বিষয় যে, শুধু আইন সাহায্য নয়, আইনের কাছে যাওয়ার সুযোগও দিতে হবে প্রত্যেক নাগরিককে। আইনের কাছে যাওয়ার সুযোগ আজ একটা আন্তর্জাতিক মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।" গত বছর ফেব্রুয়ারিতে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক হাইকোর্টে দু'টি মামলায় বাংলায় রায় প্রদান করে আইনের ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'প্রজাতন্ত্রের বিচার শক্তি ও জনগণের অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য। "পরভাষায় আইন চর্চার ফলে আমরা আইনশাস্ত্রে স্বাভাবিক সহজতা লাভ করিনি, তেমন কোনো মৌলিক অবদানও আমরা রাখিনি। একজন নিরক্ষর নাগরিকের কাছে বাংলায় কেন, যে কোনো ভাষাতেই লেখা রায় দুর্বোধ্য হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলায় তা লেখা হলে কেউ পড়ে শুনালে, তার অনেকখানি মর্মোদ্ধার তার পক্ষে করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে বড়ো রকমের যুক্তি প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আইনী সমাজে আজ একটা বহু আলোচিত বিষয় যে, শুধু আইন সাহায্য নয়, আইনের কাছে যাওয়ার সুযোগও দিতে হবে প্রত্যেক নাগরিককে।

বিচারক, ফরিয়াদী ও আসামীর ভাষা পরস্পরের বোধগম্য না হলে সুবিচার সুনিশ্চিত হতে পারে না। বিদেশী ইংরেজী ভাষার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে না পারার কারণে 'ভিলেজ ইন দি জাঙ্গল' নামের একটি উপন্যাসের নায়ক কিভাবে মৃত্যুদন্ডের শিকার হয়েছিল সে কাহিনী জানা যায় শ্রীলঙ্কার ভাষা সমস্যার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা সংবিধানগত বৈধতা লাভ করার পরও প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায়শই অনীহা দেখা যায়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১২ মার্চ এক সরকারী নির্দেশ দিয়ে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নথিপত্র বাংলা ভাষায় সংরক্ষণ করার জন্য বলেন। কিন্তু অগ্রগতি হয়নি। বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে প্রচলনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে সরকার বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ জারি করেছেন। এই আইনে 'অন্য আইনে যাই কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর হবে' বাক্যটি উল্লেখ না থাকায় আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি।

বাংলাদেশের জমি-জমা বা রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ অধিকাংশ বাংলা ভাষায় লিখিত। বিবাহের কাবিননামাও বাংলা ভাষাতে লেখা। এদেশে মুসলমান রাজত্বকালে ফারসি ভাষা দীর্ঘদিন রাজভাষা ছিল বলে আইন-আদালতে বহু ফরাসি শব্দ বাংলা ভাষারূপে ঢুকে পড়েছে। আইন-আদালতের ঐ ফারসিবহুল বাংলা ভাষা ইংরেজ আমলেও চালু ছিল, এখনও আছে। আবার ইংরেজ আমলের ব্যবহৃত অনেক ইংরেজী শব্দ প্রায় বাংলা শব্দ রূপে আইন-আদালতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শব্দগুলি যেমনটি আছে তেমনটি থাক। ইংল্যান্ডে ১৩৬২ সালে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড আদালতের ভাষা হিসেবে ইংরেজী ব্যবহারের প্রচলন করেন। অথচ আজও ইংল্যান্ডে আদালতে বহু ল্যাটিন, নরম্যান, ফ্রেঞ্চ শব্দের ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও বেশকিছু ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন-অ্যাটর্নি জেনারেল, আপিল, এজেন্ট, এ্যাডভোকেট, এ্যাডহক কমিটি, কমিশন, কমিশনার, কোরাম, ট্রাইবুনাল, ডেপুটি স্পীকার, বিল, রিপোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

আমাদের দেশের নিম্ন আদালতের অধিকাংশ কাজকর্ম বাংলা ভাষাতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। উচ্চ আদালতসমূহে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা যথাযথ প্রবেশাধিকার পায়নি। নিম্ন আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মামলা-মোকদ্দমার আরজি, জবাব, সওয়াল ইত্যাদি যদি বাংলা ভাষায় নিষ্পন্ন হতে পারে তাহলে উচ্চ আদালতে তা কেন সম্ভবপর হবে না তা বুঝা দুষ্কর। আমাদের দেশে যারা বিভিন্ন কারণে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন তাদের অধিকাংশই ইংরেজী জ্ঞানবর্জিত। এ অবস্থায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে আইন আদালতের কার্য নির্বাহ না হলে সে বিচার পদ্ধতি তাদের বোধগম্য হবে কি করে আর তারা যে সুবিচার পাচ্ছেন সেই বোধইবা সৃষ্টি হবে কি করে। স্বাধীন বাংলাদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে আদালতের কর্ম সম্পন্ন হওয়া উচিত।

ভাষা হলো বহতা নদী। উৎসমুখ থেকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে সে শুধু বয়েই চলে। ভাষা হলো সভ্যতার বাহন। বাহন দুর্বল হলে সভ্যতার গতিও যায় থেমে। যে ভাষায় মহৎ সাহিত্য কীর্তি আছে, যে ভাষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক এবং সর্বোপরি যে ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায়, সেই ভাষার ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় হতে বাধ্য। আধুনিক বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে সৃজনশীলতায়, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে, শিল্পে, বহু মনীষীর কীর্তির ফসলে। তা যদি না হতো তবে সেই ভাষা বিশ্ববাসীর অঙ্গনে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলো কিভাবে?

শৈশবে 'অ-আ-ক-খ'-এর সাথে আমাদের প্রথম পরিচয়। এই বর্ণমালাই আমাদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। তাকে আমাদের ভালবাসতে হবে। জাপান যদি চৈনিক ও জাপানি বর্ণ মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার বর্ণ বাধ্যতামূলকভাবে আয়ত্ত করে শিক্ষার সর্বস্তরে তা চালু করতে পারে, আমরা মাত্র আটচল্লিশটি বর্ণে তা পারবো না কেন? নিশ্চয়ই পারব। ■